আনন্দবাজার পত্রিকা
অনলাইন সংস্করণ
১২ পৌষ ১৪২৭ রবিবার ■ ২৭ ডিসেম্বর ২০২০ ■ ই-পেপার

https://www.anandabazar.com/supplementary/rabibashoriyo/75-years-of-ghanada-1.1249761

ঘনাদা ৭৫

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

ছবি: অমিতাভ চন্দ্র।

৭২ নম্বর বনমালী নস্কর লেনে এক মেসের বাসিন্দা। তাঁর বৈশিষ্ট্য আজগুবির মোড়কে রহস্য পরিবেশন। ঘটনাস্থল সাখালিন দ্বীপপুঞ্জ হোক বা ক্যারিবিয়ান সমুদ্র, ঘনশ্যাম দাস এক ও অদ্বিতীয়। আজ থেকে ৭৫ বছর আগে প্রেমেন্দ্র মিত্রর কলমে তাঁর আত্মপ্রকাশ।

হিসেব করে দেখছি, ঘনাদার প্রথম গল্পটি লেখা হয়েছিল পঁচাত্তর বছর আগে। গত পঁচাত্তর বছরে পৃথিবীর অনেক রহস্যই অনাবৃত হয়ে গেছে, অনেক বিস্ময় আর বিস্ময় নেই। অনেক অজ্ঞাত এখন আমাদের জানার আওতায়। ফলে ঘনাদার বেশ কিছু গল্পের আবেদন ফিকে হয়ে গেছে। যেমন ব্রকোলি নিয়ে বাহাত্তর নম্বর বনমালী নস্কর লেনের মেসবাড়ির বাসিন্দাদের যে বিস্ময় এবং অজ্ঞতা, তা আজকের পাঠকের কাছে কোনও বিস্ময়ের বস্তু নয়। ব্রকোলি আজ অতি পরিচিত একটি সব্জি। জিন সেঙের নামও আর কারও অপরিচিত নয়। তবু ওর মধ্যেও প্রেমেন্দ্র মিত্র ব্রকোলি কী ভাবে উৎপন্ন করা হয়, সেটি উন্মোচিত করে দিয়েছিলেন, যা এখনও

আমরা অনেকেই জানি না। ঘনাদা গুলবাজ, এই আকাট সত্যটিকে সামনে ঝুলিয়ে রেখে প্রেমেন্দ্র মিত্র কিন্তু বিস্তর জ্ঞানগর্ভ সত্যের সন্ধান দিয়েছেন। নিয়মিত ন্যাশনাল জিয়োগ্রাফিক পত্রিকাটি পড়তেন তো বটেই, বিজ্ঞানের হালফিল সব খবরও রাখতেন।

লেখক প্রয়াত হয়েছেন '৮৮ সালে। ঘনাদার গল্প তখন থেকেই থেমে গেছে বটে, কিন্তু আজও তার অভিঘাত রয়ে গেছে। রয়ে গেছে, তার কারণ, গল্পের বাঙালিয়ানার বাতাবরণে কাহিনি বুননের বৈঠকি চাল। প্রেমেন্দ্র মিত্র কখনও মেসবাড়িতে থেকেছেন কি না তা জানি না, তবে আমি দীর্ঘকাল হস্টেল, বোর্ডিং এবং মেসবাড়িতে থেকেছি। নিজস্ব অভিজ্ঞতার নিরিখে বিচার করে বলতে পারি, বাহাত্তর নম্বরের মেসবাড়িতে মধ্যবিত্ত বাঙালির মেসবাড়ির আবহ মোটেই নেই। দু'বেলা সেখানে এমন এলাহি এবং মহার্ঘ খাদ্যদ্রব্যের আয়োজন থাকে, যা মেসবাড়ির মধ্যবিত্ত বাজেটে সম্ভবই নয়। তার ওপর ঘনাদার মন জোগাতে যে রাজসিক আয়োজন করা হয়, তার পয়সা কে জোগায় তাও এক প্রশ্ন। বিকেলে বিপুল জলখাবারের পর রাতেও প্রায় বিয়েবাড়ির নৈশভোজ খাওয়া পেটরোগা বাঙালির পক্ষে কী ভাবে সম্ভব, তাও প্রেমেনদাকে আমার জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে করে। কিন্তু তা সত্ত্বেও ঘনাদার গল্পে সব কিছুই লেখার গুণে সত্যাশ্রয়ী হয়ে ওঠে।

শুধু বিজ্ঞান আর ভূগোলই নয়, ঘনাদার অনেক গল্পে মহাভারতের নানা মজার ও অভিনবত্বে ভরা নতুন মূল্যায়নেরও অবতারণা করা হয়েছে। এই সব গল্প পড়লে বোঝা যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র কত অভিনিবেশে মহাভারত পাঠ করেছেন এবং তা নিয়ে নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণও করেছেন। এই প্রজ্ঞা বিস্ময়কর তো বটেই, নতুন করে ভাবনারও উদ্রেক করে। অথচ প্রেমেন্দ্র মিত্র একাধারে লেখক, কবি, চিত্রনাট্যকার, চিত্রপরিচালক, নাট্যকার, নাট্যপরিচালক এবং আরও নানাবিধ কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত এক জন সদাব্যস্ত মানুষ। শুনেছি, তিনি পাকা ব্রিজ খেলোয়াড় ছিলেন এবং প্রচুর খেলতেন। তার মধ্যেও মহাভারতাদি পুরাণগ্রন্থ আদ্যোপান্ত পড়তেও আটকায়নি! শুধু পড়াই তো নয়, তাতে নতুন আলোকপাতও করেছেন। এই মেধার দিশা পাওয়া কঠিন।

শিবু, শিশির, গৌর আর সুধীর মোট চার জন স্থায়ী বাসিন্দা এবং ঘনাদাকে নিয়ে বাহাত্তর নম্বর মেসবাড়ি। তবে মাঝে মাঝে বাপি সমাদ্দার বা ও রকম আর কেউ কেউ মেসবাড়ির বাসিন্দা হয়েছে বটে তবে মিশ খায়নি এবং টিকতেও পারেনি। ঘনাদাই কূটকৌশলে তাদের তাড়িয়েছেন। কারণ ওই চার জন স্থায়ী বাসিন্দার প্রতি তাঁর বল্গাহীন পক্ষপাত। অন্য কেউ এই পরিমণ্ডলে ঢুকলে কেমন যেন তাল কেটে যায়, তাই প্রেমেন্দ্র মিত্র তাঁর ঘনাদার গল্পের মূল ধারা বজায় রাখতে বেশি নতুনত্বের আমদানি করেননি। যত নতুনত্ব তা আমদানি করেছেন ঘনাদা-কথিত অভিনব গল্পসমূহে।

ঘনাদা সমগ্রের সম্পাদক সদ্যপ্রয়াত সুরজিৎ দাশগুপ্তর প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্রর ডাকনাম ছিল সুধীর। তাই বোধহয় এই সব গল্পের কথকও সুধীর, অর্থাৎ প্রেমেন্দ্র নিজেই। ঘনাদা লম্বা, শুঁটকো চেহারা, বয়সের গাছপাথর নেই, প্রচুর গড়গড়া টানেন এবং সিগারেটও খান, আবার ভয়ঙ্কর রকমের পেটুক। বলাই বাহুল্য, ঘনাদা এক জন বুদ্ধিমান ও চারচোখো ব্যক্তি এবং তাঁর জ্ঞান অপরিসীম। এত বিষয়ের খবর রাখেন, যা মেসবাড়ির সদস্যদের হতবুদ্ধি এবং প্রায় সম্মোহিত করে রাখে। ঘনাদা যে গুল ঝাড়ছেন তাতে তাদের সন্দেহমাত্র নেই, তবু ওই সব প্রকৃত তথ্যসমৃদ্ধ গালগল্প থেকে তাদের রেহাইও বা কোথায়? ঘনাদা যেন এক ম্যাজিশিয়ানের মতোই তাঁর কূটকৌশল দিয়ে তাদের আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলেছেন।

মাঝে মাঝে, মাঝে মাঝেই বা কেন, প্রায় প্রতিটি গল্পের শুরুতেই ঘনাদাকে জব্দ করার জন্য ওই চার জনকে নানা প্ল্যান করতে দেখা যায়। কিন্তু কোনও দিন সেই সব প্ল্যান সফল হতে পারে না, ঘনাদার উল্টো চালে। ঘনাদা গুল মারেন জেনেও কিন্তু তাঁকে সন্তুষ্ট রাখতে এবং তাঁর মন জুগিয়ে চলতে এই চার জনের প্রয়াসের অন্ত নেই। তার কারণ ঘনাদার গালগল্পের অমোঘ চমৎকারিত্ব এবং প্রবল আকর্ষণ।

বাংলা সাহিত্যে গুলবাজ চরিত্র বেশ কয়েক জন আছে বটে, কিন্তু সে সব চরিত্র নেহাতই মজার। ঘনাদার বৈশিষ্ট্য হল আজগুবি গল্পের বাতাবরণে নানা রহস্যময় অজানা তথ্যের উন্মোচন, যা ইতোপূর্বে আর কারও কলম থেকে বেরোয়নি। ঘনাদার অবিশ্বাস্য বীরত্ব বা কৃতিত্বের বর্ণনায় মজা আছে বটে, কিন্তু কাহিনি ও তথ্যে কোনও ভুলচুক নেই। সেই দিক থেকে ঘনাদা এক ও অদ্বিতীয়।

গল্পগুলির অবতারণাপর্ব অভিনব এবং প্রেমেন্দ্র মিত্রের নিজস্বতার নির্ভুল ছাপ তাতে গভীর ভাবে আছে। প্রায় প্রতিটি গল্পের শুরুতেই দেখি ঘনাদাকে জব্দ করার বা মান ভাঙানোর পরামর্শ চলছে এবং নানা উদ্যোগ করা হচ্ছে। অবশ্যই ঘনাদার তথা ঘনশ্যাম দাসের চাতুর্যে তা শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়। আর তার পরই ঘনাদার গল্পটির অবতারণা হয়ে থাকে। প্রথমেই একটি বহ্বারম্ভ আছে, অর্থাৎ কয়েকটি আপাত পারম্পর্যহীন সঙ্কেতবাক্য। এবং তা নিয়ে শিবু, গৌর, শিশির বা সুধীরের নানা টীকাটিপ্পনী। ঘনাদার উদ্দেশে কিছু চাপা ব্যঙ্গবিদ্রুপও বর্ষিত হয়, যাতে ঘনাদা বিন্দুমাত্র টলটলায়মান হন না। নির্বিকার মুখে দাবা-খেলুড়ির মতো গল্পের পরবর্তী মুভটি দেন এবং প্রতিপক্ষ যথারীতি মাত হয়ে যায়।

যেমন 'ধুলো' গল্পটি শুরু হচ্ছে এ ভাবে—"বার্মুডা, না বাহামা?"তার পরই শিবু অ্যান্ড কোম্পানির নানা টিপ্পনী, রঙ্গরসিকতা ইত্যাদির পর ঘনাদার দ্বিতীয় রহস্যময় সঙ্কেতবাক্যটি পাওয়া যায়—"ফ্লোরা কি ডোরার দেখা অবশ্য তখনও পাইনি।"

তারও বেশ কিছুটা ন্যারেশনের পর আসে তৃতীয় বাক্য—শিবু আর সুধীরের টিপ্পনি "পেলে কী কেলেঙ্কারিই হত!" শুনে ঘনাদা তাঁর বাক্যটি প্রয়োগ করলেন, "কেলেঙ্কারি বলে কেলেঙ্কারি! ওদের কারও সঙ্গে দেখা হওয়া মানে একেবারে দফা রফা!"

অর্থাৎ গল্পটি সোজাসুজি বলা নয়, একটু আলাপের পর বিস্তার। কিংবা গানের শুরুতে একটু তবলার বোল তোলা আর কী। এতে গল্পটির প্রতি পাঠকের আগ্রহ বহুগুণ বেড়ে যায়, আর একটি সরসতার প্রলেপও লেগে থাকে।

প্রেমেন্দ্র মিত্রের গল্প বলার এই স্টাইলটি খুব বেশি অনুসৃত হয়নি, কারণ এ ভাবে গল্প বলতে গেলে অনেকেরই ভারসাম্য বজায় রাখা কঠিন হবে। কিন্তু প্রেমেন্দ্র তাঁর নিজস্ব অর্জিত শৈলীতে সিদ্ধহস্ত ছিলেন বলেই এত স্বচ্ছন্দে গল্পের গোলকধাঁধায় আমাদের ঘাড় ধরে নিয়ে গিয়ে ঘুরপাক খাইয়েছেন।

তবে এখানেও একটা কথা আছে। ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জ বা পৃথিবীর প্রায় সব অঞ্চলেই সামুদ্রিক ঘূর্ণিঝড়ের যে নামকরণের প্রথা আছে, তা আজকাল বাচ্চারাও জানে। বিশেষ করে যখন বলাই হচ্ছে যে, এরা এক-এক জন পাঁচ-সাতশো লোককে খুন করেছে। কিন্তু এই সব গল্প যখন লেখা হয়েছে তখনও এই নামকরণের বিষয়টি বিশ্বজনীন ছিল না হয়তো। এর পর হ্যাটি, ডোনা, হিল্ডা, হ্যাজ়েলের নামও এসেছে, যা শুনলেই আজকের যে

কেউ বলে দিতে পারবে যে, এগুলো দক্ষিণ আমেরিকার সামুদ্রিক ঘূর্ণিঝড়। কিন্তু শিবু ও অন্যেরা এদের মেয়ে বলে ধরে নিয়েছিল।

পঁচাত্তর বছর আগে ঘনাদার প্রথম গল্পটি প্রকাশিত হয়— 'মশা'। আচমকাই এটি লিখে ফেলেছিলেন প্রেমেন্দ্র। এটি নিয়ে কোনও সিরিজ় লেখার পরিকল্পনাই ছিল না তাঁর। কিন্তু প্রকাশের পর গল্পটির বিপুল জনপ্রিয়তা দেখে তিনি ঠিক করেন ঘনাদার গল্প আরও লিখবেন। সেই শুরু হয়েছিল ঘনাদার জয়যাত্রা। 'মশা' গল্পটি কেমন? এক কথায় অনবদ্য। বিশেষ করে মৃত্যুর সাক্ষাৎ দূত কালান্তক মশাটির ঘনাদার এক চপেটাঘাতে পঞ্চত্বপ্রাপ্তি, এই অ্যান্টি-ক্লাইম্যাক্সটি বহু দিন মনে থাকবে।

প্রেমেন্দ্র মিত্র এমন এক জন লেখক বা কবি যিনি বিরল প্রতিভাবলে তাঁর যুগকে শাসন করতে পারতেন। অনেকেই হয়তো জানেন না যে, স্বয়ং জীবনানন্দ দাশ প্রেমেন্দ্রর কবিতার অন্ধ ভক্ত ছিলেন এবং তাঁকে এক রকম গুরু বলে মানতেন। কবিতাগ্রন্থ 'সাগর থেকে ফেরা'-র জন্য প্রেমেন্দ্র আকাদেমি পুরস্কারও লাভ করেন।

অথচ কবি প্রেমেন্দ্রকে বাঙালি এক রকম ভুলেই গেছে। আরও আশ্চর্যের ব্যাপার, অত বড় লেখক হওয়া সত্ত্বেও তাঁর উপন্যাসের সংখ্যা নগণ্য। 'পাঁক' ছাড়া তাঁর উল্লেখযোগ্য উপন্যাসও তেমন কিছু নেই। ঘনাদার গল্প বা পরাশর বর্মার রহস্য উপন্যাস তিনি যত লিখেছেন, সেই তুলনায় তাঁর সিরিয়াস গল্প-উপন্যাস সংখ্যায় মুষ্টিমেয়। তাঁর 'সাগরসঙ্গমে' বা 'তেলেনাপোতা আবিষ্কার'-এর মতো অবিস্মরণীয় ছোট গল্প আছে বটে, কিন্তু সংখ্যায় তা এতই সামান্য যে, 'প্রেমেন্দ্র মিত্রের শ্রেষ্ঠ গল্প' গ্রন্থটি গল্পের সংখ্যাল্পতার জন্য নিতান্তই চটি একটি বই হয়ে দাঁড়িয়েছে। অথচ কবি ও গোয়েন্দা পরাশর বর্মাকে নিয়ে গাদা গাদা উপন্যাস ও গল্প লিখলেন, ঘনাদার গালগল্প নিয়েও জান লড়িয়ে দিলেন, ভূতশিকারি মেজোকর্তার গল্পও লিখলেন, কিন্তু সিরিয়াস লেখার ব্যাপারে তেমন আগ্রহই দেখালেন না। ঘনাদার গল্পগুলি তথ্যভিত্তিক, উপভোগ্য, অভিনব বটে, কিন্তু তা কদাচ গভীর অভিনিবেশ দাবি করে না, কারণ সে সব চিন্তা উদ্রেককারী রচনা নয়। পরাশর বর্মা তো আরওই নয়। নিজের প্রতিভার প্রতি এমন অবিচার তিনি কেন করলেন সেটাই প্রশ্ন। আবার নিজের চিত্রনাট্যগুলি গ্রন্থাকারে উপন্যাস বলে প্রকাশ করে এক রকম দায় সেরেছেন, যেগুলি সিরিয়াস সাহিত্যপদবাচ্যই নয়।

শেষ পর্যন্ত পাঠকরা তাঁকে শুধু ঘনাদার স্রষ্টা হিসেবেই হয়তো মনে রাখবে। আর এটা একটু দুঃখেরও ব্যাপার। কারণ যত দিন যাবে, ততই ঘনাদার আকর্ষণ কিন্তু কমবে। কারণ বিজ্ঞান এগোচ্ছে, তথ্যপ্রযুক্তি এগোচ্ছে, ভৌগোলিক জ্ঞানের প্রসার ঘটছে, অনেক বিস্ময় আর বিস্ময় থাকছে না।

'মৌলিক কাহিনী-সার বিপণন সংস্থা' (মৌ-কা-সা-বি-স) একটি গুপ্ত সমিতি, যেখান থেকে পত্রমারফত ঘনাদার কাছে নানা রহস্যময় প্রশ্ন পাঠানো হয়, সমাধান দেওয়ার চ্যালেঞ্জ জানিয়ে, তা-ও কিন্তু ঘনাদার ভক্তদেরই কীর্তি। প্রেমেন্দ্র অবশ্য ঘনাদাকে নানা বিপন্নতায় নিক্ষেপ করেও লেজেগোবরে হতে দেন না শেষ অবধি। এই মৌ-কা-সা-বি-স নিয়েও বেশ কয়েকটা গল্প আছে। আদ্যন্ত মজার।

আমি সেই বাল্যকাল থেকেই ঘনাদার গল্প পড়ে আসছি। এখনও মাঝে মাঝেই পড়ি। নতুন প্রজন্মের কাছে ঘনাদার আকর্ষণ কতটা তা জানি না, কিন্তু ওই গড়গড়ায় তামাক খাওয়া বা সিগারেটের টিন (যাতে পঞ্চাশটা সিগারেট থাকত) আত্মসাৎ করা, টঙের ঘর এবং সর্বোপরি আদ্যোপান্ত বাঙালিয়ানার বাতাবরণ আমাদের

বাল্যস্মৃতিকে ফিরিয়ে আনে এখনও। কিছু অসঙ্গতি সত্ত্বেও ওই মেসবাড়ি কলকাতার পুরনো সব মেসবাড়িকে মনে করিয়ে দেয়। আর গল্পগুলির বৈঠকি মেজাজ তো তুলনাহীন।

স্রষ্টা: প্রেমেন্দ্র মিত্র

আমার বিশেষ প্রিয় গল্পটি হল 'টুপি'। হিলারি-তেনজিং নোরগের এভারেস্ট জয়ের আগেই ইয়েতির সাহায্যে ঘনাদার এভারেস্টে ওঠার কাহিনিটি এত বিশ্বাসযোগ্য যে, মনে হবে, এমনটা তো হতেই পারে। তার ওপর হিমালয়ের ওই অঞ্চলের মানচিত্র এবং রোডম্যাপ যেন প্রেমেন্দ্র একেবারে ছকে দিয়েছেন। এই অসম্ভব কাজটি করতে তাঁকে কী বিপুল অধ্যয়ন করতে হয়েছিল, তা ভাবতে বিস্ময়ে অভিভূত হতে হয়। যে সব জায়গায় ঘনাদা অভিযান করেছেন, সেই সব জায়গায় প্রেমেন্দ্র মিত্র কখনও যাননি। কিন্তু বিবরণ দিয়েছেন প্রত্যক্ষবৎ। বড় লেখকের মেধা ও কল্পনাশক্তি সব খামতিকে পূরণ করে দিয়েছে।

কোনও কোনও গল্পে দেখছি ঘনাদা মেসের আড্ডাধারীদের তুইতোকারি করছেন। এটা ঘনাদার চরিত্রের সঙ্গে মানানসই নয়। তুইতোকারি করাটা অতিঘনিষ্ঠতার দ্যোতক, তাতে গাম্ভীর্য ও দূরত্বও বজায় থাকে না। ঘনাদার সঙ্গে শিবু-সুধীরদের সম্পর্ক ঠিক তুইতোকারির নয়। কাজেই একটু ছন্দপতন সেখানে ঘটে গেছে। আবার কিছু গল্প বিবৃত হয়েছে ভিন্ন পরিবেশে, লেকের ধারে অন্য আড্ডাধারীদের সমক্ষে। সেখানে দেখতে পাই বয়স্ক মানুষদের। স্ফীতোদর রামশরণবাবু, টেকো এবং প্রাক্তন ইতিহাসের অধ্যাপক শিবপদবাবু, পক্বকেশ হরিসাধনবাবু এবং হস্তীর মতো বিপুলকায় ভবতারণবাবু। এঁদের জমায়েতে ঘনাদাকে পেটুক হিসেবে উপস্থাপিত করা হয়নি। এখানে তিনি রহস্যময় এক চালিয়াত, তা হলেও এই সব শিক্ষিত ও ওয়াকিবহাল মানুষদের ঘোল বড় কম খাওয়াননি। এই আসরেই ঘনাদা খানিক ইতিহাস, খানিক রূপকথা মিশিয়ে 'রবিনসন ক্রুশো মেয়ে ছিলেন' গল্পটি ফাঁদেন। গল্পটি কিন্তু ভারী ভাল।

বাংলা রসসাহিত্যকে সমৃদ্ধ ও আলোকিত করে আছে ঘনাদার গল্পসমূহ। শুধু হাসির বা মজার গল্প বলে এগুলির মূল্যমান নির্ধারণ করা যাবে না। মজার আবরণে এবং হাসির মোড়কে এই সব গল্পে বিরল সব তথ্য পরিবেশিত হয়েছে, যা আমাদের আরও জানার আগ্রহকে বহুগুণ বাড়িয়ে দেয়। জ্ঞানবিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিচরণ করে শুধু তথ্যই আহরণ করেননি, অনেক প্রশ্নও উস্কে দিয়েছেন। ঘনাদা চরিত্রটি সৃষ্টির জন্য প্রেমেন্দ্র মিত্রের প্রতি আমাদের অপরিসীম ঋণ রয়ে গেল।

Original post

আনন্দবাজার পত্রিকা
রবিবাসরীয়
কলকাতা রবিবার ২৭ ডিসেম্বর ২০২০

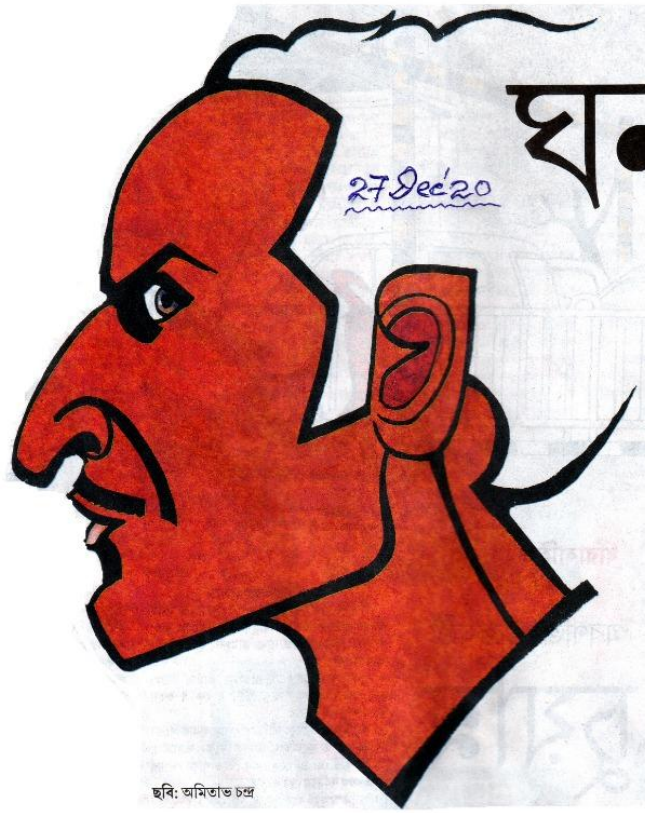

ছবি: অমিতাভ চন্দ্র

ঘনাদা ৭৫

৭২ নম্বর বনমালী নস্কর লেনে এক মেসের বাসিন্দা। তাঁর বৈশিষ্ট্য আজগুবির মোড়কে রহস্য পরিবেশন। ঘটনাস্থল সাখালিন দ্বীপপুঞ্জ হোক বা ক্যারিবিয়ান সমুদ্র, ঘনশ্যাম দাস এক ও অদ্বিতীয়। আজ থেকে ৭৫ বছর আগে প্রেমেন্দ্র মিত্রর কলমে তাঁর আত্মপ্রকাশ।

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

হিসেব করে দেখছি, ঘনাদার প্রথম গল্পটি লেখা হয়েছিল পঁচাত্তর বছর আগে। গত পঁচাত্তর বছরে পৃথিবীর অনেক রহস্যই অনাবৃত হয়ে গেছে, অনেক বিস্ময় আর বিস্ময় নেই। অনেক অজ্ঞাত এখন আমাদের জানার আওতায়। ফলে ঘনাদার বেশ কিছু গল্পের আবেদন ফিকে হয়ে গেছে। যেমন ব্রকোলি নিয়ে বাহাত্তর নম্বর বনমালী নস্কর লেনের মেসবাড়ির বাসিন্দাদের যে বিস্ময় এবং অজ্ঞতা, তা আজকের পাঠকের কাছে কোনও বিস্ময়ের বস্তু নয়। ব্রকোলি আজ অতি পরিচিত একটি সব্জি। জিন সেঙের নামও আর কারও অপরিচিত নয়। তবু ওর মধ্যেও প্রেমেন্দ্র মিত্র ব্রকোলি কী ভাবে উৎপন্ন করা হয়, সেটি উন্মোচিত করে দিয়েছিলেন, যা এখনও আমরা অনেকেই জানি না। ঘনাদা গুলবাজ, এই আকাট সত্যটিকে সামনে ঝুলিয়ে রেখে প্রেমেন্দ্র মিত্র কিন্তু বিস্তর জ্ঞানগর্ভ সত্যের সন্ধান দিয়েছেন। নিয়মিত ন্যাশনাল জিয়োগ্রাফিক পত্রিকাটি পড়তেন তো বটেই, বিজ্ঞানের হালফিল সব খবরও রাখতেন।

লেখক প্রয়াত হয়েছেন '৮৮ সালে। ঘনাদার গল্প তখন থেকেই থেমে গেছে বটে, কিন্তু আজও তার অভিঘাত রয়ে গেছে। রয়ে গেছে, তার কারণ, গল্পের বাঙালিয়ানার বাতাবরণে কাহিনি বুননের বৈঠকি চাল। প্রেমেন্দ্র মিত্র কখনও মেসবাড়িতে থেকেছেন কি না তা জানি না, তবে আমি দীর্ঘকাল হস্টেল, বোর্ডিং এবং মেসবাড়িতে থেকেছি। নিজস্ব অভিজ্ঞতার নিরিখে বিচার করে বলতে পারি, বাহাত্তর নম্বরের মেসবাড়িতে মধ্যবিত্ত বাঙালির মেসবাড়ির আবহ মোটেই নেই। দু'বেলা সেখানে এমন এলাহি এবং মহার্ঘ খাদ্যদ্রব্যের আয়োজন থাকে, যা মেসবাড়ির মধ্যবিত্ত বাজেটে সম্ভবই নয়। তার ওপর ঘনাদার মন জোগাতে যে রাজসিক আয়োজন করা হয়, তার পয়সা কে জোগায় তাও এক প্রশ্ন। বিকেলে বিপুল জলখাবারের পর রাতেও প্রায় বিয়েবাড়ির নৈশভোজ খাওয়া পেটরোগা বাঙালির পক্ষে কী ভাবে সম্ভব, তাও প্রেমেনদাকে আমার জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে করে। কিন্তু তা সত্ত্বেও ঘনাদার গল্পে সব কিছুই লেখার গুণে সত্যাশ্রয়ী হয়ে ওঠে।

শুধু বিজ্ঞান আর ভূগোলই নয়, ঘনাদার অনেক গল্পে মহাভারতের নানা মজার ও অভিনবত্বে ভরা নতুন মূল্যায়নেরও অবতারণা করা হয়েছে। এই সব গল্প পড়লে বোঝা যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র কত অভিনিবেশে মহাভারত পাঠ করেছেন এবং তা নিয়ে নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণও করেছেন। এই প্রজ্ঞা বিস্ময়কর তো বটেই, নতুন করে ভাবনারও উদ্রেক করে। অথচ প্রেমেন্দ্র মিত্র একাধারে লেখক, কবি, চিত্রনাট্যকার, চিত্রপরিচালক, নাট্যকার, নাট্যপরিচালক এবং আরও নানাবিধ কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত এক জন সদাব্যস্ত মানুষ। শুনেছি, তিনি পাকা ব্রিজ খেলোয়াড় ছিলেন এবং প্রচুর খেলতেন। তার মধ্যেও মহাভারতাদি পুরাণগ্রন্থ আদ্যোপান্ত পড়তেও আটকায়নি! শুধু পড়াই তো নয়, তাতে নতুন আলোকপাতও করেছেন। এই মেধার দিশা পাওয়া কঠিন।

শিবু, শিশির, গৌর আর সুধীর মোট চার জন স্থায়ী বাসিন্দা এবং ঘনাদাকে নিয়ে বাহাত্তর নম্বর মেসবাড়ি। তবে মাঝে মাঝে বাপি সমাদ্দার বা ও রকম আর কেউ কেউ মেসবাড়ির বাসিন্দা হয়েছে বটে তবে মিশ খায়নি এবং টিকতেও পারেনি। ঘনাদাই কূটকৌশলে তাদের তাড়িয়েছেন। কারণ ওই চার জন স্থায়ী বাসিন্দার প্রতি তাঁর বল্গাহীন পক্ষপাত। অন্য কেউ এই পরিমণ্ডলে ঢুকলে কেমন যেন তাল কেটে যায়, তাই প্রেমেন্দ্র মিত্র তাঁর ঘনাদার গল্পের মূল ধারা বজায় রাখতে বেশি নতুনত্বের আমদানি করেননি। যত নতুনত্ব তা আমদানি করেছেন ঘনাদা-কথিত অভিনব গল্পসমূহে।

ঘনাদা সমগ্রের সম্পাদক সদ্যপ্রয়াত সুরজিৎ দাশগুপ্তর প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্রর ডাকনাম ছিল সুধীর। তাই বোধহয় এই সব গল্পের কথকও সুধীর, অর্থাৎ প্রেমেন্দ্র নিজেই। ঘনাদা লম্বা, শুঁটকো চেহারা, বয়সের গাছপাথর নেই, প্রচুর গড়গড়া টানেন এবং সিগারেটও খান, আবার ভয়ঙ্কর রকমের পেটুক। বলাই বাহুল্য, ঘনাদা এক জন বুদ্ধিমান ও চারচোখো ব্যক্তি এবং তাঁর জ্ঞান অপরিসীম। এত বিষয়ের খবর রাখেন, যা মেসবাড়ির সদস্যদের হতবুদ্ধি এবং প্রায় সম্মোহিত করে রাখে। ঘনাদা যে গুল ঝাড়ছেন তাতে তাদের সন্দেহমাত্র নেই, তবু ওই সব প্রকৃত তথ্যসমৃদ্ধ গালগল্প থেকে তাদের রেহাইও বা কোথায়? ঘনাদা যেন এক ম্যাজিশিয়ানের মতোই তাঁর কূটকৌশল দিয়ে তাদের আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলেছেন।

মাঝে মাঝে, মাঝে মাঝেই বা কেন, প্রায় প্রতিটি গল্পের শুরুতেই ঘনাদাকে জব্দ করার জন্য ওই চার জনকে নানা প্ল্যান করতে দেখা যায়। কিন্তু কোনও দিন সেই সব প্ল্যান সফল হতে পারে না, ঘনাদার উল্টো চালে। ঘনাদা গুল মারেন জেনেও কিন্তু তাঁকে সন্তুষ্ট রাখতে এবং তাঁর মন জুগিয়ে চলতে এই চার জনের প্রয়াসের অন্ত নেই। তার কারণ ঘনাদার গালগল্পের অমোঘ চমৎকারিত্ব এবং প্রবল আকর্ষণ।

বাংলা সাহিত্যে গুলবাজ চরিত্র বেশ কয়েক জন আছে বটে, কিন্তু সে সব চরিত্র নেহাতই মজার। ঘনাদার বৈশিষ্ট্য হল আজগুবি গল্পের বাতাবরণে নানা রহস্যময় অজানা তথ্যের উন্মোচন, যা ইতোপূর্বে আর কারও কলম থেকে বেরোয়নি। ঘনাদার অবিশ্বাস্য বীরত্ব বা কৃতিত্বের বর্ণনায় মজা আছে বটে, কিন্তু কাহিনি ও তথ্যে কোনও ভুলচুক নেই। সেই দিক থেকে ঘনাদা এক ও অদ্বিতীয়।

গল্পগুলির অবতারণাপর্ব অভিনব এবং প্রেমেন্দ্র মিত্রের নিজস্বতার নির্ভুল ছাপ তাতে গভীর ভাবে আছে। প্রায় প্রতিটি গল্পের শুরুতেই দেখি ঘনাদাকে জব্দ করার বা মান ভাঙানোর পরামর্শ চলছে এবং নানা উদ্যোগ করা হচ্ছে। অবশ্যই ঘনাদার তথা ঘনশ্যাম দাসের চাতুর্যে তা শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়। আর তার পরই ঘনাদার গল্পটির অবতারণা হয়ে থাকে।

প্রথমেই একটি বহ্বারম্ভ আছে, অর্থাৎ কয়েকটি আপাত পারম্পর্যহীন সঙ্কেতবাক্য। এবং তা নিয়ে শিবু, গৌর, শিশির বা সুধীরের নানা টীকাটিপ্পনী। ঘনাদার উদ্দেশে কিছু চাপা ব্যঙ্গবিদ্রূপও বর্ষিত হয়, যাতে ঘনাদা বিন্দুমাত্র টলটলায়মান হন না। নির্বিকার মুখে দাবা-খেলুড়ির মতো গল্পের পরবর্তী চালটি দেন এবং প্রতিপক্ষ যথারীতি মাত হয়ে যায়।

যেমন 'ধূলো' গল্পটি শুরু হচ্ছে এ ভাবে—

"বার্মুডা, না বাহামা?"

তার পরই শিবু অ্যান্ড কোম্পানির নানা টিপ্পনী, রঙ্গরসিকতা ইত্যাদির পর ঘনাদার দ্বিতীয় রহস্যময় সঙ্কেতবাক্যটি পাওয়া যায়—

"ফ্লোরা কি ডোরার দেখা অবশ্য তখনও পাইনি।"

তারও বেশ কিছুটা ন্যারেশনের পর আসে তৃতীয় বাক্য—

শিবু আর সুধীরের টিপ্পনি "পেলে কী কেলেঙ্কারিই হত!" শুনে ঘনাদা তাঁর বাক্যটি প্রয়োগ করলেন, "কেলেঙ্কারি বলে কেলেঙ্কারি! ওদের কারও সঙ্গে দেখা হওয়া মানে একেবারে দফা রফা!"

অর্থাৎ গল্পটি সোজাসুজি বলা নয়, একটু আলাপের পর বিস্তার। কিংবা গানের শুরুতে একটু তবলার বোল তোলা আর কী। এতে গল্পটির প্রতি পাঠকের আগ্রহ বহুগুণ বেড়ে যায়, আর একটি সরসতার প্রলেপও লেগে থাকে।

প্রেমেন্দ্র মিত্রের গল্প বলার এই স্টাইলটি খুব বেশি অনুসৃত হয়নি, কারণ এ ভাবে গল্প বলতে গেলে অনেকেরই ভারসাম্য বজায় রাখা কঠিন হবে। কিন্তু প্রেমেন্দ্র তাঁর নিজস্ব অর্জিত শৈলীতে সিদ্ধহস্ত ছিলেন বলেই এত স্বচ্ছন্দে গল্পের গোলকধাঁধায় আমাদের ঘাড় ধরে নিয়ে গিয়ে ঘুরপাক খাইয়েছেন।

তবে এখানেও একটা কথা আছে। ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জ বা পৃথিবীর প্রায় সব অঞ্চলেই সামুদ্রিক ঘূর্ণিঝড়ের যে নামকরণের প্রথা আছে, তা আজকাল বাচ্চারাও জানে। বিশেষ করে যখন বলাই হচ্ছে যে, এরা এক-এক জন পাঁচ-সাতশো লোককে খুন করেছে। কিন্তু এই সব গল্প যখন লেখা হয়েছে তখনও এই নামকরণের বিষয়টি বিশ্বজনীন ছিল না হয়তো। এর পর হ্যাটি, ডোনা, হিভা, হ্যাঙ্গেলের নামও এসেছে, যা শুনলেই আজকের যে কেউ বলে দিতে পারবে যে, এগুলো দক্ষিণ আমেরিকার সামুদ্রিক ঘূর্ণিঝড়। কিন্তু শিবু ও অন্যেরা এদের মেয়ে বলে ধরে নিয়েছিল।

পঁচাত্তর বছর আগে ঘনাদার প্রথম গল্পটি প্রকাশিত হয়— 'মশা'। আচমকাই এটি লিখে ফেলেছিলেন প্রেমেন্দ্র। এটি নিয়ে কোনও সিরিজ লেখার পরিকল্পনাই ছিল না তাঁর। কিন্তু প্রকাশের পর গল্পটির বিপুল জনপ্রিয়তা দেখে তিনি ঠিক করেন ঘনাদার গল্প আরও লিখবেন। সেই শুরু হয়েছিল ঘনাদার জয়যাত্রা। 'মশা' গল্পটি কেমন? এক কথায় অনবদ্য। বিশেষ করে মৃত্যুর সাক্ষাৎ দূত কালান্তক মশাটির ঘনাদার এক চপেটাঘাতে পঞ্চত্বপ্রাপ্তি, এই অ্যান্টি-ক্লাইম্যাক্সটি বহু দিন মনে থাকবে।

প্রেমেন্দ্র মিত্র এমন এক জন লেখক বা কবি যিনি বিরল প্রতিভাবলে তাঁর যুগকে শাসন করতে পারতেন। অনেকেই হয়তো জানেন না যে, স্বয়ং জীবনানন্দ দাশ প্রেমেন্দ্রর কবিতার অন্ধ ভক্ত ছিলেন এবং তাঁকে এক রকম গুরু বলে মানতেন। কবিতাগ্রন্থ 'সাগর থেকে ফেরা'-র জন্য প্রেমেন্দ্র আকাদেমি পুরস্কারও লাভ করেন।

এর পর ২-এর পাতায়

স্রষ্টা: প্রেমেন্দ্র মিত্র

ছবি: অমিতাভ চন্দ্র।

স্রষ্টা: প্রেমেন্দ্র মিত্র

ঘনাদা ৭৫

প্রথম পাতার পর

অথচ কবি প্রেমেন্দ্রকে বাঙালি এক রকম ভুলেই গেছে। আরও আশ্চর্যের ব্যাপার, অত বড় লেখক হওয়া সত্ত্বেও তাঁর উপন্যাসের সংখ্যা নগণ্য। 'পাঁক' ছাড়া তাঁর উল্লেখযোগ্য উপন্যাসও তেমন কিছু নেই। ঘনাদার গল্প বা পরাশর বর্মার রহস্য উপন্যাস তিনি যত লিখেছেন, সেই তুলনায় তাঁর সিরিয়াস গল্প-উপন্যাস সংখ্যায় মুষ্টিমেয়। তাঁর 'সাগরসঙ্গমে' বা 'তেলেনাপোতা আবিষ্কার'-এর মতো অবিস্মরণীয় ছোট গল্প আছে বটে, কিন্তু সংখ্যায় তা এতই সামান্য যে, 'প্রেমেন্দ্র মিত্রের শ্রেষ্ঠ গল্প' গ্রন্থটি গল্পের সংখ্যাল্পতার জন্য নিতান্তই চটি একটি বই হয়ে দাঁড়িয়েছে। অথচ কবি ও গোয়েন্দা পরাশর বর্মাকে নিয়ে গাদা গাদা উপন্যাস ও গল্প লিখলেন, ঘনাদার গালগল্প নিয়েও জান লড়িয়ে দিলেন, ভূতশিকারি মেজোকর্তার গল্পও লিখলেন, কিন্তু সিরিয়াস লেখার ব্যাপারে তেমন আগ্রহই দেখালেন না। ঘনাদার গল্পগুলি তথ্যভিত্তিক, উপভোগ্য, অভিনব বটে, কিন্তু তা কদাচ গভীর অভিনিবেশ দাবি করে না, কারণ সে সব চিন্তা উদ্রেককারী রচনা নয়। পরাশর বর্মা তো আরওই নয়। নিজের প্রতিভার প্রতি এমন অবিচার তিনি কেন করলেন সেটাই প্রশ্ন। আবার নিজের চিত্রনাট্যগুলি গ্রন্থাকারে উপন্যাস বলে প্রকাশ করে এক রকম দায় সেরেছেন, যেগুলি সিরিয়াস সাহিত্যপদবাচ্যই নয়।

শেষ পর্যন্ত পাঠকরা তাঁকে শুধু ঘনাদার স্রষ্টা হিসেবেই হয়তো মনে রাখবে। আর এটা একটু দুঃখেরও ব্যাপার। কারণ যত দিন যাবে, ততই ঘনাদার আকর্ষণ কিন্তু কমবে। কারণ বিজ্ঞান এগোচ্ছে, তথ্যপ্রযুক্তি এগোচ্ছে, ভৌগোলিক জ্ঞানের প্রসার ঘটছে, অনেক বিস্ময় আর বিস্ময় থাকছে না।

'মৌলিক কাহিনী-সার বিপণন সংস্থা' (মৌ-কা-সা-বি-স) একটি গুপ্ত সমিতি, যেখান থেকে পত্রমারফত ঘনাদার কাছে নানা রহস্যময় প্রশ্ন পাঠানো হয়, সমাধান দেওয়ার চ্যালেঞ্জ জানিয়ে, তা-ও কিন্তু ঘনাদার ভক্তদেরই কীর্তি। প্রেমেন্দ্র অবশ্য ঘনাদাকে নানা বিপন্নতায় নিক্ষেপ করেও লেজেগোবরে হতে দেন না শেষ অবধি। এই মৌ-কা-সা-বি-স নিয়েও বেশ কয়েকটা গল্প আছে। আদ্যন্ত মজার।

আমি সেই বাল্যকাল থেকেই ঘনাদার গল্প পড়ে আসছি। এখনও মাঝে মাঝেই পড়ি। নতুন প্রজন্মের কাছে ঘনাদার আকর্ষণ কতটা তা জানি না, কিন্তু ওই গড়গড়ায় তামাক খাওয়া বা সিগারেটের টিন (যাতে পঞ্চাশটা সিগারেট থাকত) আত্মসাৎ করা, টঙের ঘর এবং সর্বোপরি আদ্যোপান্ত বাঙালিয়ানার বাতাবরণ আমাদের বাল্যস্মৃতিকে ফিরিয়ে আনে এখনও। কিছু অসঙ্গতি সত্ত্বেও ওই মেসবাড়ি কলকাতার পুরনো সব মেসবাড়িকে মনে করিয়ে দেয়। আর গল্পগুলির বৈঠকি মেজাজ তো তুলনাহীন।

আমার বিশেষ প্রিয় গল্পটি হল 'টুপি'। হিলারি-তেনজিং নোরগের এভারেস্ট জয়ের আগেই ইয়েতির সাহায্যে ঘনাদার এভারেস্টে ওঠার

স্রষ্টা: প্রেমেন্দ্র মিত্র

কাহিনিটি এত বিশ্বাসযোগ্য যে, মনে হবে, এমনটা তো হতেই পারে। তার ওপর হিমালয়ের ওই অঞ্চলের মানচিত্র এবং রোডম্যাপ যেন প্রেমেন্দ্র একেবারে ছকে দিয়েছেন। এই অসম্ভব কাজটি করতে তাঁকে কী বিপুল অধ্যয়ন করতে হয়েছিল, তা ভাবতে বিস্ময়ে অভিভূত হতে হয়। যে সব জায়গায় ঘনাদা অভিযান করেছেন, সেই সব জায়গায় প্রেমেন্দ্র মিত্র কখনও যাননি। কিন্তু বিবরণ দিয়েছেন প্রত্যক্ষবৎ। বড় লেখকের মেধা ও কল্পনাশক্তি সব খামতিকে পূরণ করে দিয়েছে।

কোনও কোনও গল্পে দেখছি ঘনাদা মেসের আড্ডাধারীদের তুইতোকারি করছেন। এটা ঘনাদার চরিত্রের সঙ্গে মানানসই নয়। তুইতোকারি করাটা অতিঘনিষ্ঠতার দ্যোতক, তাতে গাম্ভীর্য ও দূরত্বও বজায় থাকে না। ঘনাদার সঙ্গে শিবু-সুধীরদের সম্পর্ক ঠিক তুইতোকারির নয়। কাজেই একটু ছন্দপতন সেখানে ঘটে গেছে। আবার কিছু গল্প বিবৃত হয়েছে ভিন্ন পরিবেশে, লেকের ধারে অন্য আড্ডাধারীদের সমক্ষে। সেখানে দেখতে পাই বয়স্ক মানুষদের। ক্ষীতোদর রামশরণবাবু, টেকো এবং প্রাক্তন ইতিহাসের অধ্যাপক শিবপদবাবু, পক্ককেশ হরিসাধনবাবু এবং হস্তীর মতো বিপুলকায় ভবতারণবাবু। এঁদের জমায়েতে ঘনাদাকে পেটুক হিসেবে উপস্থাপিত করা হয়নি। এখানে তিনি রহস্যময় এক চালিয়াত, তা হলেও এই সব শিক্ষিত ও ওয়াকিবহাল মানুষদের ঘোল বড় কম খাওয়াননি। এই আসরেই ঘনাদা খানিক ইতিহাস, খানিক রূপকথা মিশিয়ে 'রবিনসন ক্রুশো মেয়ে ছিলেন' গল্পটি ফাঁদেন। গল্পটি কিন্তু ভারী ভাল।

বাংলা রসসাহিত্যকে সমৃদ্ধ ও আলোকিত করে আছে ঘনাদার গল্পসমূহ। শুধু হাসির বা মজার গল্প বলে এগুলির মূল্যমান নির্ধারণ করা যাবে না। মজার আবরণে এবং হাসির মোড়কে এই সব গল্পে বিরল সব তথ্য পরিবেশিত হয়েছে, যা আমাদের আরও জানার আগ্রহকে বহুগুণ বাড়িয়ে দেয়। জ্ঞানবিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিচরণ করে শুধু তথ্যই আহরণ করেননি, অনেক প্রশ্নও উস্কে দিয়েছেন। ঘনাদা চরিত্রটি সৃষ্টির জন্য প্রেমেন্দ্র মিত্রের প্রতি আমাদের অপরিসীম ঋণ রয়ে গেল।